Rajshahi University journal of arts & law   Vol. 52 (2024)   pp. 103-117
ISSN 2309-0898 (Print), 2408-8773 (Online)
https://doi.org/10.64102/rujal.0704

জীবনানন্দ দাশের কবিতা: জাদুবাস্তববাদের সুর-সন্ধান

[The Poetry of Jibanananda Das: Finding The Melody of Magical Realism]

মঞ্জু রানী দাস*

Abstract

Different forms of reality have been exposed in modern literature. Another structure of reality called magic realism specifically developed in German by Weimer Republic art. In this climate of reality, literary and art critic Franz Roh (1890-1965) suggests that the adjective magic evokes the wonder of fantasy over logic, but the target here is the material world. As a form of narrative literature it is widely used in fiction. 30's poet Jibanananda Das's nameless sense of calamity, the desire to enter the womb of a day twenty-five years later or eight years ago, has the impression of narrative even in the short lines of the poetry. The combination of these senses creates a mystical veil in his poetry as well as generates a weird and fictitious reality that invites reader to think anew. This mystery is the embodiment of magical reality? A companion to fiction, how has magical realism influenced the poetics of Jibanananda? How is the poet's poetic landscape in addition to this theory? In search of answers to these questions that arise in the mind of reader, this research-paper has been constructed.

Keywords: Magical realism, Surrealism, Fantasy, Material world, Political Powerhouse, Time, Strangeness of reality.

আধুনিক সাহিত্যে বাস্তবতার বিভিন্ন স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে। জার্মানির ভাইমার রিপাবলিক চিত্রকলা এবং লাতিন আমেরিকান সংস্কৃতির সংশ্লেষে বিশেষভাবে নির্মিত হয় বাস্তবতারই আরেক অবকাঠামো যাকে বলা হয় জাদুবাস্তবতা। জার্মান ইতিহাসবিদ ও শিল্প সমালোচক ফ্রাঞ্জ রোহ (১৮৯০-১৯৬৫) জাদুবাস্তবতার আবহে জমাটবদ্ধ অনুষঙ্গে রহস্যময় চমককে তুলে আনার কথা বলেন কিন্তু লক্ষ্য অবশ্যই এখানে বস্তুজগৎ। ন্যারেটিভ সাহিত্য-ঘরানা হিসেবে কথাসাহিত্যেই এর প্রয়োগ এবং বিস্তার। তিরিশি কবি জীবনানন্দ দাশের (১৮৯৯-১৯৫৪) নামহীন বোধের বিপর্যয়, পঁচিশ বছর পরে কিংবা আট বছর আগের কোনো একদিনের গর্ভে প্রবেশের তাড়না কবিতার স্বল্পবাকেও ন্যারিটিভিটির ছাপ রাখে। এসকল বোধের সমন্বয় তাঁর কাব্যগর্ভে রহস্যময় আবরণ সৃষ্টির পাশাপাশি যে অদ্ভুত ও ভ্রান্তিবাস্তবতার নির্মাণ করে তা-ই পাঠকচিত্তকে নতুনভাবে ভাবতে উন্মুখ করে তুলে। এই রহস্যময়তা কি জাদুবাস্তবতারই স্বরূপবাহী? কথাসাহিত্যের সহচর হয়েও জাদুবাস্তবতার বৈশিষ্ট্য কীভাবে জীবনানন্দীয় কাব্যপঙ্ক্তিকে প্রভাবিত করেছে? এর সংযোজনে কবির কাব্যভূমির রূপটিই বা কেমন? স্বাভাবিক পাঠকচিত্তে উত্থিত এসকল প্রশ্নের উত্তর অন্বেষণেই গবেষণা-প্রবন্ধটির গাঁথুনি নির্মিত হয়েছে।

বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে জাদুবাস্তববাদ নতুন একটি সাহিত্যিক মতবাদ হিসেবে প্রথম আবির্ভূত হয়। এই শতকের মাঝামাঝি সময়ে দৈনন্দিন বিষয়-আষয়গুলোকেই চরমতম বিচ্ছিন্নতার সাথে তুলে ধরার প্রবণতা সৃষ্টি হয়। মূলত তখন বিশ্বসাহিত্যের অঙ্গনে উত্তর-অভিব্যক্তিবাদী শিল্পীদের চিত্রকলার প্রভাবে মানসিক পরিবর্তনকে প্রাধান্য দিয়ে উত্তর-অভিব্যক্তিবাদ রাজত্ব চালাচ্ছিল। তখন চিত্রকলা

---

* সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, নোয়াখালী ৩৮১৪, বাংলাদেশ;
ই-মেইল: monjudas242@gmail.com

ইম্প্রেশনিস্টদের অবাস্তব চেতনাকে বিদায় জানিয়ে বাস্তবতার ভূমিতে ফিরে আসে। সেসময়ই বাস্তব জগৎকে প্রাধান্য দিয়ে জাদুবাস্তববাদী চেতনার প্রকাশ ঘটতে থাকে। একদিকে লাতিন আমেরিকার সাংস্কৃতিক আবহ, রাজনৈতিক ক্ষমতাবঞ্চিতদের ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে লড়াই এবং প্রান্তিক জীবনাচার ভয়ঙ্করভাবে বিচ্ছিন্নতা এবং ঐতিহ্যের অনুষঙ্গ অযৌক্তিক বর্ণনার আকারে সাহিত্যে স্থান পায়। অথচ এর অভ্যন্তরেই রয়ে যায় বাস্তব জীবনের লড়াই। অন্যদিকে জার্মানিতে তখন ভাইমার প্রজাতন্ত্রের প্রভাবে চিত্রকলার নতুন গড়ন সৃষ্টি হয়। তখনকার পোস্টারগুলোতেও রাজনৈতিক জীবনের প্রভাবে কখনো দেখা যায় বিচারালয় একদিকে হেলে পড়তে আবার কখনো দেখা যায় মস্তকবিহীন মানুষের আন্দোলনের ছবি। অবাস্তব এসব চিত্র বাস্তব রাজনৈতিক ও জাতীয় জীবনের রসে নিষিক্ত। জাদুবাস্তববাদের জন্ম এখান থেকেই।

'জাদুবাস্তবতা'র ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Magic Reality'- এ 'Magic' অর্থাৎ 'জাদু' এবং 'Real' অর্থাৎ 'বাস্তব' শব্দদ্বয়ের সমন্বয় সাধিত হয়েছে। 'জাদুবাস্তববাদ' শব্দটির ইংরেজি 'Magic Realism' গোড়াপত্তন হয়েছে জার্মান `Magischer Realismus' হতে। জার্মান এই শব্দটি পর্তুগিজ `Magisch-Realisme' এবং স্পেনীয় ভাষায় `Realismo-Magico'-তে পরিণত হয়। স্পেনীয় `Realismo-Magico' হতে ইংরেজি `Magic Realism' চালু হয়। বিশ শতকের ষাটের দশকে 'ম্যাজিকেল রিয়ালিজম' শব্দদ্বয় ব্যবহৃত হলেও ত্রিশের দশকেই এর আলোচনার সূত্রপাত। জার্মানির ভাইমার প্রজাতন্ত্রের চিত্রকলার একটি কৌশল আলোচনার প্রেক্ষিতে ফ্রাঞ্জ রোহ জাদুবাস্তবতার কথা বলেন। এ প্রসঙ্গে রোহ প্রবর্তিত 'নাখ্ এক্সপ্রেসিওনিজ্‌মুস্ মাগিশের রেয়োলিজ্‌মুস্ : প্রোবলেম ড্যের নয়েস্টেন অয়রোপেইশন্ মালেরাই' (Nach-Expressionismus, Magischer Realismus: Probleme der neuesten Europaischen Malerei) প্রবন্ধটির নাম সর্বাগ্রে প্রণিধানযোগ্য। ১৯২৫ সালে তাঁর এই প্রবন্ধটি প্রকাশের পর 'Ruckblick auf den Magischer Realismus' শীর্ষক আরও একটি প্রবন্ধ লিখেন। উল্লেখ্য দুটি প্রবন্ধের স্প্যানিশ অনুবাদ একত্রে ১৯২৭ সালে *Franz Roh, Realismo magico, post expressionism: problemas de la pintura europea mas reciente* শিরোনামে গ্রন্থ আকারে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থের 'Realismo magico, post expressionism: problemas de la pintura europea mas reciente' প্রবন্ধটি 'Magic Realism: Post-expressionism' নামে ইংরেজিতে অনূদিত হয়। প্রকাশবাদী শিল্পী ভ্যান গঘ (১৮৫৩-১৮৯০), পল গগাঁ (১৮৪৮-১৯০৩) প্রমুখ যখন বাস্তবতায় দ্বিধান্বিত ও অন্তর্দ্বন্দ্বে জর্জরিত হয়ে কেউ নিজেকে গুলিবিদ্ধ করেন আবার কেউ তাহিতি দ্বীপে গিয়ে প্রশান্তি কামনা করেন তখনই বাস্তবতার আরেকটি রূপ উন্মোচিত হয় ভাইমার রিপাবলিক চিত্রকলার হাত ধরে। অত্যন্ত অকেজো বক্তব্যের দ্বারা জাদুবাস্তববাদকে জাদু এবং বাস্তবতার মিশেলে সৃষ্ট একটি মতবাদ হিসেবে আখ্যায়িত করার প্রবণতা বিদ্যমান। সাধারণী দৃষ্টিতে 'জাদু' শব্দটি ফ্যান্টাসি কিংবা অলৌকিক কারসাজি বুঝাতে প্রচলিত। কিন্তু জাদুবাস্তববাদ তার থেকে ভিন্ন। মোটাদাগে ফ্যান্টাসি, রূপক, অতিলৌকিক হিসেবে একে চিহ্নিত করার প্রবণতা আছে। কিন্তু জাদুবাস্তববাদে ফ্যান্টাসি কিংবা অলৌকিক উপাদান থাকলেও এগুলোই জাদুবাস্তববাদ নয়। ফ্রাঞ্জ রোহ, কিউবার জাদুবাস্তববাদী ঔপন্যাসিক আলেহো কার্পেন্তিয়ের (১৯০৪-১৯৮০), ইতালীয় লেখক মাসসিমো বেন টেমপেল্লি (১৮৭৮–১৯৬০), আর্তুরো উসলার পিয়েত্রি (১৯০৬-২০০১) প্রমুখ জাদুবাস্তববাদী লেখক পরাবাস্তববাদী চিন্তা দ্বারা প্রভাবিত হলেও রোহ স্পষ্টতই পরাবাস্তবতা হতে একে পৃথক করে দেখেছেন। পরাবাস্তববাদী জগৎ যেখানে কল্পনা ও মনস্তত্ত্ব নির্ভর সেখানে জাদুবাস্তববাদীর জগৎ হলো বস্তুজগৎ। রবিন পালের বক্তব্য অনুসারে:

...জাদু বাস্তববাদে জাদু কথাটি জীবনরহস্য অর্থেই আসে, ভূতের আবির্ভাব, লোকজনের অদৃশ্য হয়ে যাওয়া, অলৌকিক ব্যাপার, অ-সাধারণ ক্ষমতা, অদ্ভুত আবহ, এ-সবই আনা হয় কিন্তু বাস্তবকে বোঝানোর জন্য। জাদুর খেলা, জাদুকরের কারসাজি– জাদু বাস্তবের সঙ্গে এর সম্পর্ক নেই।...পরাবাস্তবের কারবার বাস্তবতারহিত মানব-অস্তিত্ব নিয়ে যতটা, বস্তুজগৎ নিয়ে ততটা নয়। পরাবাস্তব কল্পনা ও মন নিয়েই আগ্রহী, অন্তর্জীবন, মানবমনস্তত্ত্বকে আনতে চায় শিল্পে। কিন্তু অ-সাধারণ, জাদু বাস্তববাদে তা কৃচিৎ আসে স্বপ্ন বা মনস্তত্ত্বগত অভিজ্ঞতা মারফত, বরং এখানে জাদু ঘটানো হয় স্পর্শযোগ্য বস্তুসত্য নিয়েই।[১]

পরাবাস্তববাদ এবং জাদুবাস্তববাদের এই পার্থক্য রোহর দৃষ্টিতে স্পষ্টতই প্রকাশিত। Maggie Ann Bowers তাঁর *Magic(al) Realism*-এ রোহর দৃষ্টিতে পরাবাস্তববাদ এবং জাদুবাস্তববাদের যে পার্থক্য সে সম্পর্কে বলেন:

Roh considered magic realism to be related to, but distinctive from surrealism due to magic realism's focus on the material object and the actual existence of things in the world, as opposed to the more cerebral and psychological reality explored by the surrealists.[২]

অর্থাৎ পরাবাস্তববাদী, রূপক, ফ্যান্টাসি, রূপকথা কিংবা অলৌকিক পরিবেশ যা রহস্যময়তা সৃষ্টি করে তা-ই শিল্প-সাহিত্যে জাদুবাস্তববাদ নয়। বস্তুজগৎকে মূল লক্ষ্য হিসেবে বিবেচনা করে সম্ভব-অসম্ভবের সহাবস্থানে ভ্রান্তি এবং অদ্ভুত রস সৃষ্টি করে মানুষের প্রকৃত অস্তিত্ব এবং সংস্কৃতির বদলজনিত রূপ উন্মোচিত করে প্রকারান্তরে জীবনরহস্য এবং জীবনবেদকেই নির্দেশ করে এমন সাহিত্য মতবাদ হলো জাদুবাস্তববাদ।

সাধারণত লাতিন আমেরিকাকে জাদুবাস্তববাদের ভিত্তিভূমি হিসেবে চিন্তা করা হয়। তার কারণস্বরূপ জাদুবাস্তববাদে যে সাংস্কৃতিক বিশেষত্ব বিদ্যমান তা স্মরণীয়। এর পশ্চাতে কিউবান ঔপন্যাসিক আলেহো কার্পেন্তিয়ের এবং গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজের (১৯২৭-২০১৪) নাম স্মরণীয়। কারণ যে ভূগোল এবং সংস্কৃতি তাঁদের লেখায় স্থান পেয়েছে তা লাতিন আমেরিকান। এতে কল্পনার মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলকে নির্ধারণ করা হয় যা ফ্যান্টাসির আবহে রাজনৈতিক শক্তিকেন্দ্রের উত্থান ও পরিচয় বহন করে। অতি পরিচিত পৃথিবীকে দুমড়ে-মুচড়ে উপস্থাপন করে। অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক বিধ্বস্ত অঞ্চল এবং সময় এমনভাবে ধারণ করে যা অতি পরিচিত প্রান্তিক মানুষের। বিপর্যয় সৃষ্টিকারী ধ্বংসাত্মক ফ্যান্টাসির আবহ জীবন এবং মৃত্যুকে সামনাসামনি দাঁড় করায়। ভয় এবং রহস্যময় পরিস্থিতি এমনভাবে অবস্থান করে যা যেকোনো সময় স্থান বদল করতে পারে। সম্ভব-অসম্ভব আখ্যানের এমন উপস্থাপন নিমেষেই বাস্তবকে অবাস্তব এবং অবাস্তবকে বাস্তব পৃথিবীর বলে জানান দেয়। ভ্রান্তি ও অদ্ভুত বাস্তবতার মিশেলে জীবনরহস্য উত্থাপন করা হয়। চকিতেই সময় এবং পরিপ্রেক্ষিতের বদল মানব-অস্তিত্বকে অতীত কিংবা ভবিষ্যৎ যেকোনো বিন্দুতে দাঁড় করিয়ে দিতে পারে। বিশ্বসাহিত্যে গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ, কার্পেন্তিয়ের, পিয়েত্রি, মিগুয়েল অ্যাঞ্জেল আস্তুরিয়াস (১৮৯৯-১৯৭৪), টেমপেল্লি, সালমান রুশদি (জন্ম- ১৯৪৭), টনি মারসন (১৯৩১-২০১৯) প্রমুখের নাম জাদুবাস্তববাদী লেখক হিসেবে উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস (১৯৪৩-১৯৯৭), শহীদুল জহীর (১৯৫৩-২০০৮), নাসরীন জাহান (জন্ম- ১৯৬৪) প্রমুখের নাম উল্লেখ করা যায়। এ পর্যন্ত কথাসাহিত্যেই জাদুবাস্তববাদের প্রয়োগ এবং ধারাক্রম নিয়ে আলোচনা হয়ে আসছে। সাহিত্যের ক্ষেত্রে এটি মূলত নব্য বস্তুনিষ্ঠা এবং ন্যারেটিভ হওয়ায় উপন্যাস ও গল্পে স্থান পায়।

কবিগুরুর কবিতায় রয়েছে 'আজি হতে শতবর্ষ পরে'র কথা। টাইমসিস্ফনির এরকম ব্যবহার অসম্ভব কেননা শতবর্ষ পরের কথা কারোর পক্ষেই জানা সম্ভব নয় কিন্তু জীবনের অভিজ্ঞতার নির্যাস একে সত্য বলে জানান দেয়। ফলে মনে হতেই পারে কবিগুরুর কাব্যভূমে প্রথম জাদুবাস্তববাদের নির্যাস পাওয়া

যায়। কিন্তু সমগ্র কবিতাটি তৎক্ষণাৎ জানিয়ে দেয় অভিজ্ঞতা-সচেতন মনোবৃত্তির মানসাকাঙ্ক্ষা এখানে কার্যকর। এ যতোটা না জাদুবাস্তববাদের নির্যাস তার চেয়েও বেশি রোমান্টিক মনোবৃত্তির প্রকাশ যা ব্যক্তির নার্সিসিস্ট মনোভাব দ্বারা আক্রান্ত। কিন্তু তিরিশি কবি জীবনানন্দ দাশের (১৮৯৯-১৯৫৪) কাব্যপঙ্‌ক্তি ব্যক্তিমানসের অভ্যন্তরীণ জীবনরহস্য এমনভাবে ধারণ করে আছে যা কোনো ব্যক্তিমানুষই অস্বীকার করতে পারে না অথচ সম্ভব এবং অসম্ভবের আবরণে মোড়ানো। প্রেম, কীর্তি, সচ্ছলতা থাকা সত্ত্বেও যে বোধের তাগিদে আট বছর আগের একদিনের সেই মানুষটির আত্মহত্যার সরণি নির্মাণ করেন তা আধুনিক যেকোনো মানুষের কাছেই সত্য অথচ সেই বোধ আজও রহস্যাবৃত। ব্যক্তির যে অন্তরীণ বাস্তবতাকে কবি জীবনানন্দ কাব্যে ধারণ করেছেন তা তাঁর কাব্যের পঙ্‌ক্তিকে শঙ্খের মধ্য দিয়েই সমুদ্রগর্জন ধ্বনিত করে। ফলে জাদুবাস্তববাদী ন্যারেটিভিটি কাব্যের অবয়ব নিয়েই নির্ণীত হয়। জাদুবাস্তববাদের যে স্বরূপ জীবনানন্দের কাব্য অবলম্বনে কাঠামোপ্রাপ্ত হয়েছে তার ধারাবাহিক পর্যালোচনা নিচে আলোকপাত করা হলো।

ম্যাজিক রিয়েলিজমের অঙ্গনে রাজনৈতিক ক্ষমতাবঞ্চিত জীবনের আখ্যানের সঙ্গে ঔপনিবেশিক প্রভাব-বিস্তারী সমাজবাস্তবতা প্রেক্ষিত হিসেবে স্থান পায়। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যায় আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের *খোয়াবনামা*(১৯৯৬) উপন্যাস। ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ হতে তেভাগা আন্দোলন ঘুরেফিরে জায়গা করে নিয়েছে। ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সাধারণ সমাজজীবন পরিপার্শ্ব হিসেবে উত্থাপিত। মার্কেজের উপন্যাস প্রসঙ্গে রবিন পালের বক্তব্য: 'রাজনৈতিক কথাবার্তা বলার জন্যই জাদুবাস্তবতার কৌশল তাঁর একাধিক লেখায় দেখা যায়।'[৩] কিন্তু আধুনিক কবি জীবনানন্দ দাশ *ধূসর পাণ্ডুলিপি* কাব্যের 'অবসরের গান' কবিতায় সাম্রাজ্যবাদী সম্রাটের ছদ্মবেশ, সৈন্যদের মশালের রং এমনকি রাজ্য আর সাম্রাজ্য সমস্তকিছু উপেক্ষা করেছেন। বৈশ্বিক রাজনীতির পট হতে দৃষ্টি ফেরাতে ব্যতিব্যস্ত কবির বক্তব্য:

> রোধ—অবরোধ—ক্লেশ— কোলাহল শুনিবার নাহিকো সময়,—
> জানিতে চাই না আর সম্রাট সেজেছে ভাঁড় কোনখানে,—
> কোথায় নতুন করে বেবিলন ভেঙে গুঁড়ো হয়!
> আমার চোখের পাশে আনিও না সৈন্যদের মশালের রং
> দামামা থামায়ে ফেল,— পেঁচার পাখার মতো অন্ধকারে ডুবে যাক রাজ্য
> আর সাম্রাজ্যের সং![৪]

তবে কি কবি রাজনীতি বিমুখ? কিন্তু প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিধ্বস্ত ও রক্তক্লান্ত সভ্যতার নাগরিক হয়ে যিনি ব্যক্তিমনের অভ্যন্তরীণ ভাঙা-গড়াকে ধারণ করতে উৎসুক তিনি কি সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতির দিক হতে মুখ ফেরাতে পারেন? এরকম প্রশ্ন তো থেকেই যায়। এই প্রশ্নেরই উত্তর নিয়ে *রূপসী বাংলা* কাব্যের 'তুমি কেন বহু দূরে' কবিতাটির উপস্থিতি। অতীতের এশিরিয়া, উজ্জয়িনী, বেবিলনের সভ্যতা বর্তমানে স্বপ্ন। ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী ক্ষমতার বিস্তারে রূপসী বাংলার মিনার ধ্বসে পড়ে। কবির কাব্যপঙ্‌ক্তি–

> আমরা মিনার গড়ি— ভেঙে পড়ে দু'দিনেই— স্বপনের ডানা ছিঁড়ে ব্যথা
> রক্ত হয়ে ঝড়ে শুধু এইখানে— ক্ষুধা হয়ে ব্যথা দেয়— নীল নাভিশ্বাস
> ফেনায়ে তুলিছে শুধু পৃথিবীতে পিরামিড-যুগ থেকে আজো বারোমাস;
> আমাদের সত্য, আহা, রক্ত হয়ে ঝড়ে শুধু;— আমাদের প্রাণের মমতা
> ফড়িঙের ডানা নিয়ে ওড়ে, আহা : চেয়ে দেখে অন্ধকার কঠিন ক্ষমতা
> ক্ষমাহীন— বারবার পথ আটকায়ে ফেলে— বারবার করে তারে গ্রাস;[৫]

যে ক্ষমতা বারবার পথ আগলে দাঁড়ায় তা মূলত সাম্রাজ্যবাদী পরাশক্তি। *বনলতা সেন* কাব্যের 'শিকার' কবিতায় কবি এরূপ ক্ষমতার প্রতীক হিসেবেই 'বন্দুক' আর 'টেরিকাটা মানুষের মাথা'র কথা বলেন। অর্থাৎ রাজনৈতিক শক্তিকে কবি এড়িয়ে যাননি বলেই রাজ্য আর সাম্রাজ্যের সঙের কথা বলেন। এক্ষেত্রে প্রশ্ন হলো কবি যে রাজনৈতিক বাতাবরণ ধারণ করেছেন তার স্বরূপ কেমন? এর উত্তর পাওয়া যায় কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত'র বক্তব্যে। তিনি বলেন : '[...] জীবনানন্দের নাগরিকতার পরিবেশ যুদ্ধকালীন কলকাতা, যেখানে সামন্ততন্ত্রের চিহ্ন বিলীন হচ্ছে ক্রমশ, গড়ে উঠছে ক্রমে ক্রমে বণিক সভ্যতা'[৬]। অর্থাৎ যুদ্ধকালীন বাস্তবতায় কলকাতাকে কেন্দ্র করে কবি নব্য ধনতান্ত্রিক সমাজের উত্থান দেখান। জাদুবাস্তববাদে রাজনৈতিক শক্তিকেন্দ্রে এমন ঘটনার আখ্যান থাকে যা অমোঘ পরিবর্তন ডেকে আনে। জীবনানন্দ দাশের যুদ্ধকালীন কলকাতার বাস্তবতা তেমনি। 'বেরাল' কবিতায় এর চিত্র বিদ্যমান। টুকরো টুকরো মাছের কাঁটা গলাধঃকরণের সফলতা, সূর্যের পেছনে ধাবিত হয়ে কখনো দৃশ্যমান কখনো আড়ালে ডুব দেওয়া সুযোগসন্ধানী রাজনৈতিক চরিত্রকে উত্থাপন করে। পুঁজি আর সাম্রাজের রং মেখে অবশেষে এরূপ ধনবাদী চরিত্রেরা সমগ্র পৃথিবীকেই পুঁজি, ইন্টারেস্ট, মুনাফা আর উৎপাদনের যন্ত্র বিবেচনায় সূর্য গ্রাস করে অন্ধকার মানবসমাজের স্তরে স্তরে পৌঁছে দেয়। কবির কাব্যভাষ্য:

> হেমন্তের সন্ধ্যায় জাফরান-রঙের সূর্যের নরম শরীরে
> শাদা থাবা বুলিয়ে বুলিয়ে খেলা করতে দেখলাম তাকে;
> তারপর অন্ধকারকে ছোটো ছোটো বলের মতো থাবা দিয়ে লুফে আনল সে
> সমস্ত পৃথিবীর ভিতর ছড়িয়ে দিল।[৭]

এই বণিকসভ্যতার গর্ভে নিমজ্জিত মানবসমাজ যে শ্রেণিকরণে বিভক্ত হয়ে অবস্থান করে তার সত্যও কবি দৃষ্টি এড়ায়নি। *মহাপৃথিবী* কাব্যের 'আজকের এক মুহূর্ত' কবিতায় কবি দেখান সামন্তবাদী শাসকরূপীদের মূঢ়তার দিন সমাপ্ত হয়েছে। পরিবর্তে পুঁজিপতিরা আড়ালে থেকে 'শাদা, হলদে, লাল, কালো মানুষদের/ আর কোনো শেষ বক্তব্য আছে কি না জিজ্ঞাসা করে'[৮]। ঔপনিবেশিক সভ্যতার অংশীদার হিসেবে পুঁজিবাদী সমাজপতিদের এই শ্রেণিকরণ সামাজিক-আর্থিক শোষণের চাকা সচল রাখে। অন্যদিকে জীবনের তথা জীবনযাপনের নিশ্চয়তা হারানোর ভয়ে দিব্যি মানুষগুলো সব আপোষে জীবন কাটায়। অন্ধকারই স্বাভাবিক বলে মনে হয় তখন। 'মনোসরণি' কবিতায় কবি সাম্রাজ্যবাদী ও আপোষকামী এই সভ্যতার অংশীদারদের একজন হয়েই বলেন:

> মনে হয় সমাবৃত হয়ে আছি কোনো এক অন্ধকার ঘরে; —
> দেয়ালের কার্নিশে মক্ষিকারা স্থিরভাবে জানে:
> এইসব মানুষেরা নিশ্চয়তা হারায়েছে নক্ষত্রের দোষে;
> পাঁচ ফুট জমিনের শিষ্টতায় মাথা পেতে রেখেছে আপোষে।[৯]

যুদ্ধ, রক্ত, রিরংসা, ভয় আর উৎকোচে ভারাক্রান্ত কবির দেখা নাগরিকজীবন। সমকালের বিশ্ব রাজনৈতিক দোলাচল, নাগরিকজীবনের জটিল ছকে ঠাসা তাঁর *সাতটি তারার তিমির* (১৯৪৮) ১৯৪২, ১৯৪৩, আর ১৯৪৪-এর বয়ান নির্মাণ করে। ইসাবেল আইয়েন্দে (জন্ম- ১৯৪২) রচিত *ভূতেদের ঘর বাড়ি* (১৯৮২) উপন্যাসে দেখা যায় মিলিটারি শাসনের তীব্রতা আর অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে জনসংগ্রামের তীব্র প্রবাহ। আইয়েন্দে যা আশির দশকে দেখিয়েছেন কবি জীবনানন্দ তার বৈরিতা পঞ্চাশের দশকেই দেখাতে পেরেছেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ধারণ করে। শব জড়িয়ে পড়ে থাকে অথচ তার মাঝেও মৃত্যুর ভয়। মৃতদেহের মৃত্যুভয় হাস্যকর এবং অকল্পনীয় ঠেকলেও মানসিক ও দৈহিক মৃত্যুর বহর তো মিথ্যে নয়। অন্তর্সত্তাকে চোখঠার দিয়ে ঘুমন্ত অবস্থায় রেখে মৃত সভ্যতার শব হয়ে আপোষে বাঁচে যে জীবন মানসিক থেকে দৈহিক মৃত্যুই তার কাছে অধিকতর ভয়াবহ। কবি স্পষ্টতই বলেছেন:

নগরীর রাজপথে মোড়ে মোড়ে চিহ্ন পড়ে আছে;
একটি মৃতের দেহ অপরের শবকে জড়ায়ে
তবুও আতঙ্কে হিম- হয়তো দ্বিতীয় কোনো মরণের কাছে।[১০]

মূলত চিত্রকলায় যখন প্রথম জাদুবাস্তববাদী ধরন স্থান করে নেয় তখন রাজনীতির আবহই মুখ্য ভূমিকা পালন করে। এক্ষেত্রে Maggie Ann Bowers -এর বক্তব্য হলো: 'The historical context in which magic realist painting developed was that of the unstable German Republic during the period 1919-23'.[১১] অর্থাৎ ১৯১৯ হতে ১৯২৩ পর্যন্ত সময়কে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করেছেন তিনি। কায়জার দ্বিতীয় উইলিয়ামের ওয়েল্ট পলিটিক্সের দরুন ইউরোপীয় রাজনৈতিক অঙ্গনে অস্থিতিশীলতা, সামরিকবাদ ও সংঘাতের ফলস্বরূপ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং জার্মানির সাম্রাজ্যবাদী নীতির পরাজয়। ফলে ১৯১৮ সালে কায়জারের ক্ষমতাচ্যুতি ও পলায়ন, জার্মানির উগ্র বৈদেশিক নীতির ভাঙন ও জার্মানির অর্থনীতির চূড়ান্ত দুরবস্থা , মুদ্রাস্ফীতি, যুদ্ধে পরাজয় জার্মানির জাতীয় সংকট তীব্র করে। এরূপ পরিস্থিতিতে মানুষের প্রকৃত অস্তিত্ব প্রদর্শনের জন্য জাদুবাস্তববাদের ঘানি টানা হয়। রাজনৈতিক ক্ষমতাবঞ্চিত মানুষের অন্তর্বয়ান নির্মিত হয়। কার্পেন্তিয়ের যেমন দাস বিদ্রোহের ইতিহাস নিয়ে রচনা করেন *এই মর্ত্যের রাজত্ব* উপন্যাস এরূপ জাতীয় জীবনের সংকট উন্মোচন করেছেন কবি 'সূর্যপ্রতিম' কবিতায়। ব্যক্তির মৃত্যুর শেষে জাতীয় মৃত্যুর অনুভবে 'জেগে ওঠে উনিশশো তেতাল্লিশ, চুয়াল্লিশ, অনন্তের/ অফুরন্ত রৌদ্রের তিমিরে'[১২]। জাদুবাস্তববাদের দ্বারা ঘেরা রাজনৈতিক আবহ আকস্মিকভাবেই বাস্তবের বদল ঘটায়। চেনা পৃথিবীর হঠাৎ পরিবর্তন চোখে পড়ে। কিন্তু কবির চেনা পৃথিবীতে কীরূপ বদল ঘটে? যদি ইতিবাচক বদল ঘটতো তবে কী আক্ষেপের সুরে বলতেন–

একটি বিরাট যুদ্ধ শেষ হয়ে নিভে গেছে প্রায়
আমাদের আধো-চেনা কোনো– এক পুরোনো পৃথিবী
নেই আর। আমাদের মনে চোখে প্রচারিত নতুন পৃথিবী
আসেনি তো।[১৩]

অর্থাৎ কবি যে পৃথিবীর কামনা করেন সেরকম পৃথিবীর উত্থান ঘটেনি। তাহলে যুদ্ধবিধ্বস্ত সভ্যতায় কোনো পরিবর্তন সাধিত হয়েছে? সামন্তবাদী সমাজের ভাঙনের পর যে নতুন পৃথিবীর পট নির্মিত হয়েছে সেখানকার চিত্র ঠিক কেমন? উত্তরে বলতে হয় হেজিমনি পলিটিক্সের কথা। হেজিমনি পলিটিক্স বা আধিপত্যবাদী রাজনীতি যেখানে সাম্রাজ্যবাদী সিংহাসনই মুখ্য। ক্ষমতার সিংহাসনে আরোহণ মাত্রই রাষ্ট্রনায়ক হয়ে উঠেন ক্ষমতার প্রতীক। বিড়ালের মুখে ইঁদুর কিংবা ইঁদুরের মুখে বিড়াল ধরার ন্যায়। 'সুবিনয় মুস্তফী' কবিতায় কবি যেমনটা দেখিয়েছেন। অর্থাৎ যখন যার হাতে ক্ষমতা তখন সে-ই হয়ে উঠছে দণ্ডধারী শাসক। আধিপত্যবাদী শাসকের রূপে আবির্ভূত হতেই যেন রাজনৈতিক ছত্রছায়ার আয়োজন। আধিপত্যবাদী রাজনীতিতে সুযোগসন্ধানী চরিত্রেরা সব ইঁদুর আর বিড়ালের ভূমিকায় অবতীর্ণ। কবির ভাষ্যমতে–

ইঁদুরকে খেতে খেতে শাদা বেরালের ব্যবহার,
অথবা টুকরো হ'তে হ'তে সেই ভারিক্কে ইঁদুর:
** *
তবুও বেদম হেসে খিল ধরে যেত ব'লে বেরালের পেটে
ইঁদুর হুররে' ব'লে হেসে খুন হ'তো সেই খিল কেটে কেটে।[১৪]

সামন্তবাদী রাজনৈতিক বিশ্বের বদল কবি দেখিয়েছেন। পরিবর্তে আধিপত্যবাদী রাজনৈতিক অবকাঠামোর আগ্রাসন নীতির প্রচলনও কবি লক্ষ করেছেন।

ম্যাজিকেল রিয়েলিটি, মারভেলাস রিয়েলিটি পদবাচ্যসমূহ পরস্পর একত্রে উচ্চারিত হবার প্রবণতা রয়েছে। ফ্যান্টাসি এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচ্য। রহস্যময়তা বা অতিলৌকিকতা যা ফ্যান্টাসি সৃষ্টির সহায়ক জাদুবাস্তববাদে এর স্বরূপ অনেকটাই আলাদা। রোমান ক্যাথলিকদের উৎসব ভ্রাম্যমান আনন্দমেলা কার্নিভালকে কেন্দ্র করে যে Carnivalized Reality গড়ে উঠে তার কথা আলোচনায় আনা আবশ্যক। Carnivalized Reality তে ফ্যান্টাসি আসে অনিবার্য প্রসঙ্গ হিসেবে। জাদুবাস্তববাদে ফ্যান্টাসির চমৎকারিত্ব স্বীকৃত এবং উভয়ক্ষেত্রে ফ্যান্টাসি ধ্বংসাত্মক বা বিপর্যয় সৃষ্টিকারী ভূমিকায় অবতীর্ণ। এমন বিপর্যয় সৃষ্টিকারী আখ্যান 'ক্যাম্পে' কবিতায় কবি জীবনানন্দ সৃষ্টি করেছেন। যৌনজীবন এবং প্রেমের বিকৃত রূপ এখানে প্রেমিকাকে শিকারের টোপে পরিণত করে এবং প্রেমিককে শিকার করা হয় কৌশলে। অ্যাঞ্জেলা কার্টার (১৯৪০-১৯৯২) রচিত *ওয়াইজ চিল্ড্রেন* (১৯৯১) যৌনতার বিধ্বংসী রূপ নিয়ে হাজির হয়। কবি জীবনানন্দ যখন বলেন-

চাঁদের আলোয় ঘাইহরিণী আবার ডাকে;
এইখানে প'ড়ে থেকে একা একা
আমার হৃদয়ে এক অবসাদ জমে ওঠে
বন্দুকের শব্দ শুনে শুনে
হরিণীর ডাক শুনে শুনে।[১৫]

চাঁদের আলো আর হরিণীর ডাকের মদমত্ততায় বিধ্বংসী যৌনজীবন এবং মৃত্যু পরিণামী আখ্যান তুলে ধরে। কবি-সমালোচক বুদ্ধদেব বসু প্রসঙ্গতই বলেছেন:

> 'ক্যাম্পে' কবিতায় মৃগয়ার গল্প অবলম্বন করে 'প্রেমের ভয়াবহ গম্ভীর স্তম্ভ' তুলেছেন তিনি, মানবিক প্রেমের, যৌন প্রেমের, যা ব্যাপ্ত হয়ে আছে 'কোথাও ফড়িঙে কীটে, মানুষের বুকের ভিতরে', যার ক্ষমতার চাপে ক্ষমতাশালী মাংসাশী শিকারিদেরও হৃদয়গুলো 'বসন্তের জ্যোৎস্নায় মৃত মৃগদের' মতোই পাংশু হয়ে পড়ে থাকে।[১৬]

কিন্তু কার্নিভাল রিয়েলিজম এবং ম্যাজিক রিয়েলিজমের ক্ষেত্রে ফ্যান্টাসি এবং যৌনতার রূপ কী একই? উত্তরে বলতে হয় উভয়ে উন্মত্ত বিপর্যয় সৃষ্টিকারী ফ্যান্টাসি ধারণ করে কিন্তু কার্নিভাল বাস্তবতার রূপ ভিন্ন। উভয় ক্ষেত্রে ফ্যান্টাস্টিক বিষয় আছে কিন্তু কার্নিভাল বাস্তবতা মৃত্যুর দিকে টানে জীবনানন্দের ঘাইহরিণীর মতোই। অন্যদিকে জাদুবাস্তববাদ জীবন কামনা করে। মৃত্যু নয়। তবে কি জীবনানন্দের কবিতা কার্নিভাল বাস্তবতা ধারণ করে? এই প্রসঙ্গে David K. Danow এর বক্তব্য উত্থাপন প্রাসঙ্গিক। উভয়ের স্বরূপ প্রসঙ্গে তিনি বলেন:

> Yet the respective emphases of the two literary forms differ. What magical realisms portrays is ultimately positive, affording a hopeful vision of life in which what might be termed fantastic is designed to appear plausible and real…Where one form illustrates the endless potential for life, the other (largely determined by historical fact) reveals a powerful tendency towards death…[১৭]

আশাবাদী জীবনদৃষ্টি ইতিবাচক চিন্তা-চেতনার দ্বারা জীবনবোধের দিকে ম্যাজিক রিয়েলিজম মানুষকে ধাবিত করে। কিন্তু ফ্যান্টাসির বিপরীত রূপ বহন করে পরিশেষে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়াই হলো কার্নিভাল রিয়েলিটির চূড়ান্ত রূপ। বসন্তের জ্যোৎস্নায় মৃত মৃগদের মতো কবি-অস্তিত্ব মৃত্যুর দিকে ধাবমান চেতনাকে চিহ্নিত করা সত্ত্বেও এটাই জীবনানন্দীয় কাব্যভাবনার পরিণাম নয়। কেননা 'এ-সব কবিতা আমি' কবিতায় কবি অতীতের নারীদের মৃত মুখ স্মরণ করেন। অতীত আর বর্তমানের সীমা লঙ্ঘন করে হিমবাহ

চৈতন্য অতিক্রমণের মাধ্যমে কবি স্বপ্নের মধ্যেই তাদের জাগরণ দেখিয়েছেন। 'চলে গেছে পৃথিবীর সবচেয়ে শান্ত হিম সান্ত্বনার ঘরে:/ আমার বিষণ্ন স্বপ্নে থেকে থেকে তাহাদের ঘুম ভেঙে পড়ে'[১৮] বলে কবি জীবন ভাবনা-ই উচ্চকিত করেন। রহস্যাবৃত 'মৃত্যুনদী' আর 'দৈব আঁধার আকাশবাণী' যে ইতিহাসের ধারা নির্মাণ করে সেখানে কবির মৃত্যুচেতনা অবশ্য ক্রিয়াশীল। অন্ধকারের আড়ালে হারিয়ে যাওয়া স্বদেশের ভূমিতে আঁধারকেই মুখ্য বিবেচনা করেছেন। জীবন নাকি মৃত্যুবোধ কোনটি প্রকৃত অর্থে সত্য এরকম বিতর্কের অবকাশ থামে না। কবি যখন বলেন: 'আজকে এখন আঁধারে অনেক মৃত ঘুমিয়ে আছে।/ অনেক জীবিতেরা কঠিন সাঁকো বেয়ে মৃত্যুনদীর দিকে/ জলের ভিতর নামছে'[১৯] তখন দীপ্তি ত্রিপাঠীর বক্তব্যই সত্য বলে মনে হয়। স্বপ্নময় জগতেও আশ্রয় গ্রহণ সম্ভব নয় বলে তিনি জানিয়েছেন কবির কাব্যচৈতন্য প্রসঙ্গে। তাঁর ভাষ্যমতে: '[...] না আছে ব্যথায় নিরাময়তা, না বিক্ষোভে শান্তি, না চিন্তার নৈরাজ্যে বিশ্বাসের ধ্রুবতারা। অথচ স্বপ্নজগৎ রচনা ক'রে তার মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করাও সম্ভব নয়।'[২০] এরকম বিশ্বাস-অবিশ্বাস সম্ভব-অসম্ভবের দোলাচল ম্যাজিক রিয়েলিজমে ভর করে থাকে ফ্যান্টাসির ঊর্ণাজালে। ক্লিন্টন বি সিলিও কবির কাব্য প্রসঙ্গে বলেছেন যে, 'মৃত্যু সব সময় জীবনানন্দকে আকর্ষণ করেছে'[২১]। কিন্তু কবির কাছে মৃত্যু আকর্ষণীয় হলেও মৃত্যু অতিক্রমণের মানসও দৃষ্টি এড়ায় না। ফলে তাঁর কাব্যে নষ্ট পচা শসার পাশে শিশিরের শুভ্রতা, বিমর্ষ পাখির রঙের পাশেই বাঁকা নীল চাঁদের শীতলতা কিংবা মৃত চোখ ও বিলীন স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষার পাশে কমলা রঙের রোদের উজ্জ্বলতা সহজেই চোখে পড়ে। সত্তার পুনরাবির্ভাব অসম্ভব অথচ কবির চৈতন্য বলে:

বুদ্ধের চেয়েও আরো দীন সুষমার সুজাতার
মৃত বৎসকে বাঁচায়েছে
কেউ যেন;
মনে হয়,
দেখা যায়।[২২]

কবিমনের এই অকথিত অনুচ্চারিত বিশ্বাসই হলো জাদুবাস্তববাদের ভীত যা অবশেষে জীবনবোধ ও আশাবাদ ত্বরান্বিত করে আমাদের সামনে। এই আশাবাদই তাঁকে মাইলের পর মাইল বিস্তৃত দিগন্তজোড়া অন্ধকার পাড়ি দেবার দিকে আগ্রহী করে তোলে যেমনটা আমরা দেখি কার্পেন্তিয়েরের *এই মর্ত্যের রাজত্ব* উপন্যাসে। সেখানে চরিত্রেরা মৃত্যুর সময় উড়ে যাবার শক্তি নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। রমানাথ রায়ের *কাঁকন* উপন্যাসে অর্ধপক্ষী গরুড়ের সাথে কাঁকনকে উড়ে যেতে দেখা যায় স্বর্গের দিকে। কবি জীবনানন্দের কাব্যগর্ভে অন্ধকার পেরুনোর জন্য উড়ে যাবার ইচ্ছে পোষণ করা হয়:

মাইলের পরে আরো অন্ধকার ডাইনী মাইলের
পাড়ি দেওয়া পাখিদের মতো
নক্ষত্রের জ্যোৎস্নায় জোগান দিয়ে ভেসে
এ অনন্ত প্রতিপদে তবু
চাঁদ ভুলে উড়ে যাওয়া চাই,
উড়ে যেতে চাই।[২৩]

কবির কাছে জীবনবোধই প্রাধান্য পায় বিধায় কঠিন পৃথিবীর বাসিন্দা হয়ে চারপাশ অবলোকন করেন এবং হতাশ হন। তিনি মার্কেজের 'সরলা এরেন্দিরা' গল্পের নায়কের ন্যায় আতশ কাচ দিয়ে জগৎ দেখতে চান। কমলা, নীল, সবুজ রঙে রঙিন হবে এমন পৃথিবী কল্পনা করেন। কিন্তু 'কোথাও মিনারে তুমি নেই আজ আর/ জানালার সোনালি নীল কমলা সবুজ কাচের দিগন্তে;/ কোথাও বনচ্ছবির ভিতরে

নেই;'[২৪] বলে যখন অনুভব কবির গাঢ় হয় তখন মুখরিত আত্মার আহ্বান নিরব হয়ে আসে। কিন্তু কবির ইঙ্গিত হলো সেই আতশ কাচ যা বিপ্লব সৃষ্টিকারী ফ্যান্টাসির বাহক এবং সেইসঙ্গে নেতির বোধ প্রশমিত করে জীবনের আলোকরেখা করে উজ্জ্বল।

কাল্পনিক স্থানের মাধ্যমে কোনো জাতির সংস্কৃতি এবং সাংস্কৃতিক সংশ্লেষণের বাস্তুসংস্থান বিনির্মিত হয় জাদুবাস্তববাদে। এক্ষেত্রে কেউ প্রান্তিক ভূমি বাছাই করেন আবার কেউ বৃহত্তর রাজনৈতিক ও নাগরিকজীবন ধারণের অভিপ্রায়ে সুপরিচিত বড় শহর স্থান প্রদান করেন লেখনীতে। সাবঅল্টার্ন বা প্রান্তিক জীবন ও লাতিন অমেরিকান সংস্কৃতি উন্মোচনের অভিপ্রায়ে গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ তাঁর *একশো বছরের নিঃসঙ্গতা* (One Hundred Years of Solitude) [1967] উপন্যাসসহ *Love in the time of Cholera* (1985) এবং *The Autumn of the Patriarch* (1975) উপন্যাসে মাকোন্দো নামক শহরের উল্লেখ করেছেন যার অস্তিত্ব বাস্তবে নেই। কিন্তু তাঁর কল্পনায় বাস্তব। সালমান রুশদির উপন্যাসে আছে নিউইয়র্কের মতো নাগরিক অঞ্চল। জীবনানন্দের প্রথম জীবন অতিবাহিত হয় বরিশালে। চাকরিসূত্রে কলকাতায় আগমন এমনকি কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় সাতটি বছর বেকার জীবন অতিবাহিত করেছেন। কলকাতাকে কেন্দ্র করে কবি হাজার বছর পথ অতিক্রম করেছেন। কবি বলেন:

> আর কিছু দেখেছি কি: একরাশ তারা আর মনুমেন্ট-ভরা কলকাতা?
> চোখ নিচে নেমে যায়– চুরুট নীরবে জ্বলে–বাতাসে অনেক ধুলো খড়;
> চোখ বুজে একপাশে সরে যাই–গাছ থেকে অনেক বাদামী জীর্ণ পাতা
> উড়ে গেছে; বেবিলনে একা একা এমনই হেঁটেছি আমি রাতের ভিতর
> কেন যেন; আজো আমি জানি নাকো হাজার হাজার ব্যস্ত বছরের পর।[২৫]

কলকাতাকে কেন্দ্র করে কবি অকল্পনীয় হাজার হাজার ব্যস্ত বছর পার করেছেন। যে বেবিলনীয় সভ্যতায় হেঁটেছেন তাও মূলত কলকাতাকেন্দ্রিক। জাদুবাস্তববাদে এরূপ কেন্দ্রীয় স্থান কোনো নির্দিষ্ট স্থানই নয় বরং সার্বভৌম জাতিরাষ্ট্রকেও ডিঙিয়ে বৈশ্বিক আবহ নিয়ে বিরাজ করে। মার্কেজের লেখায় যেমন করে মাকোন্দো শহরের উপস্থিতি। জাদুবাস্তববাদের এই মাকোন্দো শহর প্রসঙ্গে Stephen M. Hart এবং Wen-Chin Ouyang এর বক্তব্য হলো: 'Macondo does not offer a place to which the reader can retrea, a world that is either just real or just magical. The realism of the real is permeated by magic just as the world of the ,magical is underpinned by the real.'[২৬] অর্থাৎ মাকোন্দো শুধু নির্দিষ্ট একটি স্থান নয় বরং বৈশ্বিক প্রতিবিম্ব যা বাস্তব অথবা জাদু উভয়ই হতে পারে। কবি জীবনানন্দের কলকাতা নগরীও জাদুবিশ্বের প্রতিবিম্ব যেখানে 'রাতচরা ডাঁশ' বা গো-মাছিরা বেন্টিঙ্ক স্ট্রিটে নদীর জলের ধারে বসে পৃথিবীর ন্যায়-অন্যায় গণনার দায়িত্ব পালন করে। গো-মাছির এই আচরণ আপাতদৃষ্টে অস্বাভাবিক এবং অসম্ভব বিষয়। কিন্তু পুঁজিবাদী সভ্যতার অংশীদার কলকাতার যে রূপ তিনজন আধা আইবুড়ো ভিখিরির মাধ্যমে কবি বয়ান করেছেন 'লঘু মুহূর্ত' কবিতায় তা বাস্তবতারহিত নয়। এজন্য কবির বর্ণনায় কলকাতাকেন্দ্রিক নগরবিশ্ব জাদুবিশ্বের প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়। কবির ভাষ্য:

> এ সব সফেন কথা শুনে এক রাতচরা ডাঁশ
> লাফায়ে লাফায়ে যায় তাহাদের নাকের ডগায়;
> নদীর জলের পারে ব'সে যেন, বেন্টিঙ্ক স্ট্রীটে
> তাহারা গণনা ক'রে গেল এই পৃথিবীর ন্যায় অন্যায়;[২৭]

বেন্টিঙ্ক স্ট্রিটের নগরী কলকাতা পৃথিবীর আকৃতি নিয়ে উপস্থিত এবং রাতচরা ডাঁশের আচরণ কুহকী বাস্তবতার প্রতীক। মূলত কবি ঔপনিবেশিক বাস্তবতা এবং তার গর্ভে উত্তরণকামী জনতার সংগ্রাম কলকাতাকে কেন্দ্র করে উপস্থাপন করেন। কবির দেখা সপ্তর্ষিমণ্ডল যখন অন্ধকারে গা ডুবিয়ে থাকে তখন ঔপনিবেশিক শাসকের দ্বারা শাসিত রক্তের অর্গানে সংগ্রামী চৈতন্য মূর্ত হয়। প্রাণদানের আহ্বান ধ্বনিত হয়-

দিল্লি কলকাতার নক্‌টার্নে
অভিভূত হয়ে গেলে মানুষের উত্তরণ জীবনের মাঝপথে থেমে
মহান তৃতীয় অঙ্কে : গর্ভাঙ্কে তবুও লুপ্ত হয়ে যাবে না কি!—
সূর্যে, আরো নব সূর্যে দীপ্ত হ'য়ে প্রাণ দাও—দাও পাখি।[২৮]

আফ্রো-আমেরিকান লেখক টনি মরিসনের লেখনীতে ছোট্ট নগরীকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক সামাজিক টেনশন রূপদান করেছেন। নাসরীন জাহান *চন্দ্রলেখার জাদুবিস্তার* (১৯৯৫) উপন্যাসে দেশজ-গ্রামীণ রূপকথার আবহে নিয়ে এসেছেন আশির দশকের স্বৈরশাসনের আখ্যান। অর্থাৎ জাদুবাস্তবে স্থান এবং সংস্কৃতির বিকাশ হয় পোস্টকলোনিয়াল বা কলোনিয়াল রাজনৈতিক শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে পরিচালিত জনমানসের সংগ্রাম বয়ানের লক্ষ্যে। কোনো স্থান ও সংস্কৃতি সুনির্দিষ্টভাবে একক স্থান বা সংস্কৃতির পরিপোষক হিসেবে আসে না। এর আগমনের প্রকৃত কারণ সম্পর্কে Bowers বলেন: 'This has meant that much magical realism has originated in many of the postcolonial countries that are battling against the influence of their previous colonial rules, and consider themselves to be at the margines of imperial power.'[২৯] জীবনানন্দ কাব্য রচনাকালে ঔপনিবেশিক শাসনের কেন্দ্রভূমি ভারতবর্ষে কলকাতা নগরী-ই ছিলো। কলকাতাকে কেন্দ্র করেই পরিচালিত হয় জনমানসের সংগ্রাম। ফলস্বরূপ কলকাতাকে কেন্দ্র করেই কবি ভারতবর্ষের ঔপনিবেশিক শাসনচিত্র এবং সংগ্রামের রূপ প্রতীকায়িত করেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিধ্বস্ত কলকাতা নগরীর চিত্রে ধারণ করেন বাংলার চিত্র। যুদ্ধকালীন বাস্তবতার প্রেক্ষিতে দেখেন মদ আর নারী জলের মতো মাতাল সেনানায়কের হাতে ব্যবহৃত হচ্ছে। ক্ষয় আর বিধ্বংসী সভ্যতার রক্তাক্ত জমিনে কলকাতাকে অন্তিম নিশীথের রূপে প্রত্যক্ষ করেন। সমাধির ভিড় সেখানে। কবির বর্ণনা অনুসারে:

শেষ ট্রাম মুছে গেছে, শেষ শব্দ, কলকাতা এখন
জীবনের জগতের প্রকৃতির অন্তিম নিশীথ;
চারিদিকে ঘর বাড়ি পোড়ো সাঁকো সমাধির ভিড়;[৩০]

কবির কলকাতা যেমন সমগ্র নাগরিকবিশ্ব এবং পবির্তনশীল সময়, ঔপনিবেশিক শাসনকেন্দ্রের প্রতিরূপ হিসেবে বর্তমান তেমনি তাঁর শৈশব-কৈশোরের বরিশাল শহর হয়ে উঠেছে বাংলার সংস্কৃতি ও প্রকৃতির প্রতিবিম্ব। *রূপসী বাংলা* কাব্যে যে শঙ্খমালা, মানিকমালা আর বেহুলা-লহনার আখ্যান বেনোজলে ভেসে বেড়ায় তাতে যে দেশজ ঢং আর প্রকৃতির অনুষঙ্গ তাতে বরিশাল শহরের প্রাকৃতিক আবরণ স্পষ্ট। সেইসঙ্গে স্পষ্ট সময়রেখার উল্লঙ্ঘনে শতশতাব্দী পূর্বেকার অস্তিত্বে বিলীন হবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা–

যখন ময়ূরপঙ্খী ভোরের সিন্ধুর মেঘে হয়েছে অবাক,
সুদূর প্রবাস থেকে ফিরে এসে বাংলার শুপুরির বন
দেখিয়াছে– অকস্মাৎ গাঢ় নীল: করুণ কাকের ক্লান্ত ডাক
শুনিয়াছে– সে কত শতাব্দী আগে ডেকেছিল তাহারা যখন।[৩১]

মিগুয়েল অ্যাঞ্জেল আস্তুরিয়াসের উপন্যাস *ভুট্টা মজুর* (১৯৪৯)-এ দেখা যায় মায়া মিথলজি, দেশজ সংস্কৃতি এবং ঔপনিবেশিক পীড়নের বিমিশ্রণ। জীবনানন্দের ভাষ্যে মধুকূপী ঘাস, শ্রীমন্ত, বেহুলা-লহনার কাহিনির

পাশে পদ্মা-জলাঙ্গীর ঢেউ, শঙ্খচিলের বিচরণ বরিশাল শহরের প্রাকৃতিক সুষমায় আচ্ছাদিত। কলকাতাকে ঘিরে যেভাবে নাগরিক পুঁজিবাদী বিশ্বের ছায়া এঁকেছেন তেমনি দেশীয় সংস্কৃতি ও গ্রামীণ বাংলার ভাঙা-গড়া দেখাতে বরিশালকে তাঁর কাল্পনিক রাজ্যে স্থান দিয়েছেন।

সময়চেতনা জীবনানন্দীয় কাব্যের অন্যতম বিশেষত্ব হিসেবে বিবেচিত হয়। অন্যদিকে জাদুবাস্তববাদে দেখানো হয় সময়ের আকস্মিক পরিবর্তন, চোখের নিমেষমাত্রই জীবনের এক বিরাট রূপান্তর, যা অসম্ভাব্য এক বাস্তবকে ধারণ করে । একে অস্বীকারও করা যায় না আবার স্বীকৃতি প্রদানও কষ্টকর। প্রদ্যুম্ন মিত্র জীবনানন্দের সময়চেতনা নিয়ে বলেছিলেন যে, ''সময়' নিয়ে জীবনানন্দের পরিণত মন কিছু ভাবনা অনুভাবনায় মগ্ন হয়েছিল ঠিকই, তবে সে সব ভাবনাকণা কোন যথার্থ সুগ্রথিত দার্শনিক চিন্তায় আশ্রিত হয়েছিল একথা বলা যাবে না।'[৩২]কবির সময় কোনো দার্শনিক চিন্তাকে আশ্রয় করেনি সত্য তবে ইতিহাসবোধির আলোকে যে সময় তিনি কাব্যে ধারণ করেছেন তা অতীত, বর্তমান আর ভবিষৎকে এক কাতারে দাঁড় করায়। অতীত যেন বর্তমানে উপবিষ্ট সত্য আর ভবিষ্যৎ আজকের বিন্দুতে দাঁড়িয়ে। 'মাঠের গল্প' কবিতায় "মেঠো চাঁদ" অংশে সময় এসে চলে যাবার কথা যখন বলেন তখন মনে কল্পবিজ্ঞানে যে সময় প্রত্যাবর্তনশীল তাকে কবি স্থান দেননি। তবে অতীত কীভাবে বর্তমানে দণ্ডায়মান? *বনলতা সেন* কাব্যপাঠে সেই প্রশ্নের উত্তর মেলে। "বনলতা সেন' কাব্যগ্রন্থে জীবনানন্দ কিন্তু নিউটনীয় প্রত্যাবর্তনশীল চিন্তাতেই মগ্ন থাকলেন।'[৩৩] সময় ফিরে ধাবিত হয় অন্ধকারের দিকে। বলেছেন হাজার বছর পথ অতিক্রমণের কথা:

> হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে,
> সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মালয় সাগরে
> অনেক ঘুরেছি আমি; বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে[৩৪]

নিশীথের অন্ধকার আর বিম্বিসার সম্রাটের ধূসর অতীত যে প্রত্যাবর্তন করবে না এটা কবির জ্ঞাত। কিন্তু নিউটনীয় চেতনার আবহে সময় তার সীমারেখা অতিক্রম করে বর্তমানের সীমায় অবস্থান করে। যে রহস্যময় পটভূমি এতে সৃষ্টি হয় তা আপাতদৃষ্টে যুক্তিসীমা লঙ্ঘন করে কিন্তু ইতিহাসের উপাদান এবং কবির অস্তিত্ব মিথ্যা নয়। এমনকি প্রতীক্ষার একাকিত্ব আর সময় একে অন্যের দিকে ধাবিত বিধায় বর্তমানে দাঁড়িয়ে পঁচিশ বছর পরে কবিপ্রিয়াকে আমন্ত্রণ জানান। যে সময় চলে যায় সে সময় ফিরে আসে না তথাপি কবির বক্তব্য:

> শেষবার তার সাথে যখন হয়েছে দেখা মাঠের উপরে—
> বলিলাম, 'একদিন এমন সময়
> আবার আসিও তুমি— আসিবার ইচ্ছা যদি হয়!—
> পঁচিশ বছর পরে।'[৩৫]

জীবনানন্দের এই কালচেতনা পুনর্জন্মের তত্ত্বকেও টেনে নিয়ে আসে। কবি যেন জাতিস্মরের ভূমিকায় অবতীর্ণ পুরুষাকার। তিনি পূর্বেকার কোনো জন্মের স্মৃতিচারণা করেন। 'ঝ'রে গেছে কবে যে; এ জনমে নয় যেন– এই পাড়াগাঁর/ পথে তবু তিনশো বছর আগে হয়তো বা– আমি তার সাথে'[৩৬] বলে যে অতীত টেনে আনেন ইতিহাসবোধির সত্যে তা আস্থাশীল হয়ে ওঠে ভাসানের গান আর মাথুরের পালার সৌহার্দ্যে। 'সিন্ধুসারস' কবিতায় দেখি বর্তমান আর ভবিষ্যৎ একত্রে গেঁথে নিজেদের বেদনার সন্তান বলে পরিচয় দিতে। জীবনানন্দীয় ভাষ্যে 'মাতৃজঠরে প্রত্যাবর্তন আর মরণাশ্রয়বাসনা একার্থক'[৩৭] হিসেবে দেখেছেন সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়। অন্ধকারের যোনির ভিতর মিশে থাকার বাসনা সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতবাদকে সমর্থন জোগায়। কিন্তু এর অন্য অর্থও বিদ্যমান। কেননা কবি যখন বলেন: 'গাঢ় অন্ধকার

থেকে আমরা এ পৃথিবীর আজকের মুহূর্তে এসেছি/বীজের ভিতর থেকে কী ক'রে অরণ্য জন্ম নেয়'[৩৮]তখন আশাসঞ্চারী নিশ্চিন্ত জীবনের আশ্রয় প্রদর্শনের পাশেই ভ্রূণ হতে মহীরূহের উত্থান নির্দেশ করে। অন্যদিকে মাতৃজঠরে প্রত্যাবর্তন সময়ের গতিকে উল্টোদিকে নিয়ে যায় যা বাস্তবতার কুহকী ভাষ্য নির্মাণ করে।

সময়ের এই প্রবাহ এবং ভ্রান্তি ও বাস্তবতার উদ্ভটত্ব মিলে সৃষ্টি হয় জাদুবাস্তববাদের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ প্রেক্ষিত। আপাতদৃষ্টে তা ম্যাজিকের মতো অথচ বাস্তব। সময় এবং আখ্যানের এমন উপস্থাপন যাকে চোখের ভুল কিংবা অদ্ভুত বলতে বাধ্য। এই প্রসঙ্গে ইতালীয় লেখক বন টেমপেল্লির নাম উল্লেখযোগ্য। 'বলা হয় তিনিই প্রথম বাস্তবতার উদ্ভট রহস্যজনক প্রকৃতি ধারণ করতে লেখালেখিতে ম্যাজিক রিয়েলিজম প্রয়োগ করেছিলেন।'[৩৯]*একশো বছরের নিঃসঙ্গতা*'য় উরসুলার স্বামীর আচরণে তিনশো বছর পুরোনো নিয়তির কাছে ফিরে যাওয়া অদ্ভুত। কিন্তু যে দিনটির কথা বলা হয় সেদিন স্যার ফ্রান্সিস ড্রেকের রিয়োহাচায় আক্রমণ লাতিন আমেরিকার ইতিহাস প্রসিদ্ধ। নাসরীন জাহানের *চন্দ্রলেখার জাদুবিস্তারে* চন্দ্রলেখাকে ঘিরে রূপকথার নির্মাণ ভ্রান্তির সৃষ্টি করলেও এর অন্তর্নিহিতে আশির দশকের স্বৈরশাসনের যে ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয় তা অস্বীকার করা যায় না। কবি জীবনানন্দ দাশ 'অবসরের গান' কবিতায় 'মৃতের মাথার স্বপ্নে নড়ে উঠে জানায় কি অদ্ভুত ইশারা'[৪০] পঙ্‌ক্তির উচ্চারণ বাস্তবতার উর্ধ্বে মায়া সৃষ্টি করে যা অদ্ভুত বলে মনে হয়। কিন্তু 'গেঁয়ো কবি' আর 'পাড়াগাঁর ভাঁড়' যাদের ফলন্ত পুষ্ট দেহ শুষে আজকের ফসল ফলেছে তা অতিশয় বাস্তব। কবির অন্তর্সত্তার অনুভবে নির্জীব প্রাণহীন বস্তুতেও প্রাণ ও চলনশক্তি সঞ্চার হয়। মানবমনে মৃত্যু দলিত করার আকাঙ্ক্ষা প্রতিটি মানবের ক্ষেত্রেই সত্য। এই সত্যের আলোকে নক্ষত্রের দিকে ধাবমান হৃদয় মহাবিশ্বলোকের সীমানা ছাড়িয়ে যায়। এমতাবস্থায় কবির বক্তব্য:

এক একবার মনে হচ্ছিল আমার– আধো ঘুমের ভিতর হয়তো–
মাথার উপরে মশারি নেই আমার,
স্বাতী তারার কোল ঘেঁষে নীল হাওয়ার সমুদ্রে শাদা বকের মতো
উড়ছে সে![৪১]

কবিহৃদয়ের স্ফীত বেলুনের মতো মৃত্যু জয়ের আকাঙ্ক্ষা তারায় তারায় উড়ে যাবার আকুলতা জড়বস্তুর এই আচরণকেও স্বাভাবিক বলে প্রতীতি জাগায়। স্পর্শযোগ্য বস্তু নিয়ে যে রহস্য সৃষ্টির প্রবণতা জাদুবাস্তববাদে তা-ই সত্য হয়ে উঠে কবির এই লাইনে। ভোরে বা নতুন দিনের প্রত্যাশায় জাগরণের অনুভবে ঘুমিয়ে থাকা বিভ্রান্তিকর। কিন্তু জীর্ণ জীবন থেকে পলায়নের জন্য অন্ধকারে প্রবেশ তাঁর কাব্যের স্বতঃসিদ্ধ প্রবণতা। এই অন্ধকারই মাতৃজঠরের স্বরূপ নিয়ে আবির্ভূত। ক্লান্তি, ভয় এবং অস্তিত্বের গোলকধাঁধার এমন সহাবস্থান যা যেকোনো সময়ই স্থানবদল করে। যে অন্ধকার কবিকে গ্রাস করতে পারতো অবশেষে দেখা যায় সেই অন্ধকারেই মাতৃজঠরের ন্যায় কবি প্রবেশ করেন–

চোখ তুলে আমি
দুই স্তর অন্ধকারের ভিতর ধূসর মেঘের মতো প্রবেশ করলাম:
সেই মুখের ভিতর প্রবেশ করলাম।[৪২]

যাকে আর হাতের নাগালে পাওয়া সম্ভব নয় তাকেই কবি ধরতে চান পরম বিশ্বাসে। 'আমি হাত প্রসারিত করে দিই' কবিতায় এমন দৃশ্য-অদৃশ্যের সহাবস্থান। 'দেহমনের দ্বৈততা বা বৈপরীত্য নয়, কবি ধরতে চাইছেন অদৃশ্য কোনো প্রাণসত্তাকে, কিন্তু তা মোটেও অতীন্দ্রিয় নয়।'[৪৩] অদৃশ্য কিন্তু অতীন্দ্রিয় নয় এমন বাস্তব সত্তাকে ঘিরে রচিত *খোয়াবনামা* উপন্যাসের অতিবাস্তব দৃশ্য-পরম্পরা বাস্তবকেই অলক্ষ্যে আঁকড়ে থাকে। ইসাবেল আইয়েন্দের *ভূতেদের ঘর বাড়ি*'তে ভূতেদের সঙ্গে বসবাসের অন্তরালে রয়ে যায়

সরকারি নিপীড়ন আর মিলিটারি শাসনের গল্প। পুঁজিবাদী সমাজ ও সময় কীভাবে ব্যক্তিমানুষের অভ্যন্তরে ক্ষত সৃষ্টি করে তার চরম নিদর্শন কবির 'আট বছর আগের একদিন' কবিতাটি। বাস্তবতার এমন পটভূমি সেখানে রয়েছে যা অদ্ভুত অথচ প্রতিটি ব্যক্তিমানুষের অভ্যন্তরে এই অনুভব তীব্র। আধুনিক ফাঁপা মানুষের বাহ্যিক ঐশ্বর্যের অন্তরালে যে অভাবের তাড়না যা তাকে দূরতম দ্বীপবাসী করে অবশেষে মৃত্যুর মাধ্যমে শান্তির অন্বেষণ করে তা অতীতের পৃষ্ঠা আওড়াতে বাধ্য করে। নির্মাণ করে বর্তমানের অদ্ভুত সত্য বাস্তবতার অভিজ্ঞান। অকথিত বোধের নিমজ্জনে কবির অস্তিত্বের সঙ্গে মিশে থাকা সত্য হয় উচ্চারিত–

জানি— তবু জানি
নারীর হৃদয়— প্রেম—শিশু—গৃহ— নয় সবখানি;
অর্থ নয়, কীর্তি নয়, সচ্ছলতা নয়—
আরো এক বিপন্ন বিস্ময়
আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে
খেলা করে;[৪৪]

রক্তের ভেতরে যে বোধ খেলা করে তার তাড়নায় কবির নায়ক ঝুলে পড়ে অন্ধকারে অশ্বত্থের ডালে। কিন্তু মৃত্যু তো কোনোভাবেই জাদুবাস্তববাদী চৈতন্যে কাম্য নয়। তবে এমনকি বক্তব্য এই কবিতায় আছে যা রহস্যময়তা ও মৃত্যুবোধ সত্ত্বেও কুহকের আড়ালে অবশেষে জীবনের প্রতিই আসক্তি জানান দেয়? কবিতাটির শেষ স্তবকে উত্তর পাওয়া যায়–

হে প্রগাঢ় পিতামহী, আজো চমৎকার?
আমিও তোমার মতো বুড়ো হব— বুড়ি চাঁদটারে আমি
    ক'রে দেবো কালীদহে বেনোজলে পার;
আমরা দু'জনে মিলে শূন্য ক'রে চলে যাবো জীবনের প্রচুর ভাঁড়ার।[৪৫]

এখানে কবি পেঁচার মতোই বয়োবৃদ্ধ হয়ে মৃত্যুপথে ধাবিত হবেন বলে জানান। অর্থাৎ কোনো অকাল মৃত্যুবোধ কবিকে আকর্ষিত করে না। দুজন মিলে যখন ভাঁড়ার শূন্য করার কথা বলেন তখন নৈঃসঙ্গের বোধ অতিক্রান্ত হয়ে জীবনবোধ প্রগাঢ় হয়। এজন্যই বুদ্ধদেব বসুর বক্তব্য: 'কবিতাটি বীভৎস হতে পারতো কিন্তু হয়নি; লাসকাটা ঘর থেকে স্বপ্নলোক পর্যন্ত একটি চন্দ্রালোকিত বঙ্কিম পথ কবি এঁকে দিয়েছেন'[৪৬]। স্বপ্নলোকের আলিঙ্গন এবং দুজনের সম্মিলনে মৃত্যুর বীভৎসতা এড়িয়ে জীবনের বাস্তব বোধটুকুই এখানে সত্য বলে বিধৃত হয়।

ইতিহাসের বিচ্ছুরিত স্বেদ, রক্ত, ঘাম চারদিকের বিচিত্র ভয়-ক্লান্তি তুলে ধরে। আত্মক্রীড়ায় মত্ত কবি নীড় গড়েন অথচ তা নিমেষেই ভেঙে পড়ে। সময়ের ব্যাপ্তি যে জ্ঞান সঞ্চয় করে তাতে ভয় আর বিস্ময় পাশাপাশি হাত ধরে হাঁটে। কিন্তু সবশেষে পরিস্থিতির এমন বদল বহন করে আনে যা সমগ্র আখ্যানটিরই বদল ঘটায়। ভয় একসময় অস্তিত্ব গ্রাস করলেও পরিস্থিতির বদলে যাওয়া ভূমিতে অস্তিত্বই ভয়কে কোণঠাসা করে বস্তুজগৎকে সত্য বলে প্রমাণ করে। এরকম বস্তুসত্য ধারণ করেই কবির অনুভব: 'নচিকেতা ধর্মধনে উপবাসী হয়ে গেলে যম/ প্রীত হয়। তবুও ব্রহ্মে লীন হওয়াও কঠিন।/ আমরা এখনো লুপ্ত হইনি তো।'[৪৭]অস্তিত্বের লুপ্ত না হবার বোধই ভ্রান্তি এবং অদ্ভুত বাস্তবের প্রান্তে দাঁড়িয়ে জাদুবাস্তববাদের মৌল ভিত গড়ে তোলে। ঔপন্যাসিক যেখানে পারিপার্শ্বিক বদল দেখান কবি সেখানে দেখান ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ বোধের এই চরম রূপান্তর যা মৃত্যুতে পূর্ণতা কামনা করে না বরং জীবনযাপনের বোধে সমুজ্জ্বল।

প্রতিবেশের কুহকে আক্রান্ত জাল আর অন্ধকারের গর্ভে প্রবেশের আর্তি মৃত্যুর প্রতি আকর্ষণ কবির জাদুবাস্তব পঙ্‌ক্তিসমূহ প্রশ্নবিদ্ধ করে কিন্তু নিমেষেই সে প্রশ্ন তিরোহিত হয়। কবি অন্ধকার গর্ভে মাতৃজঠরের কল্পনা করেছেন। আশা করেছেন নিশ্চিন্ত আশ্রয়। স্বপ্নবাস্তব তুলে ধরেছেন মর্ত্যভূমিতে পা রেখেই। রূপকথার জগৎ আর অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সীমারেখা পার করে একই বিন্দুতে সমাহিত করেছেন কিন্তু এই অসম্ভবও ইতিহাসবোধি আর সময়চেতনার বদৌলতে প্রত্যাবর্তনশীল সময়ের ধারায় মিলে সঙ্গতিপূর্ণ হয়ে যায়। এসব ভ্রান্তি ও অদ্ভুত আখ্যান জীবনবোধের প্রতি জীবনের প্রতি উচ্চকিত সমর্থনে বস্তুজগতের প্রতি টানই সত্য বলে প্রমাণ করে। জীবনের প্রতি অকুণ্ঠ আগ্রহই তাঁর জাদুবাস্তববাদী পঙ্‌ক্তিগুলোর মৌলস্বরূপ। এখানেই তিনি সার্থক।

তথ্যসূত্র

১. রবিন পাল, 'জাদু বাস্তবতাঃ বাস্তবতার ভিন্ন স্বর', নবেন্দু সেন (সম্পা.), *পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্ব ও সাহিত্যভাবনা*, রত্নাবলী, কলকাতা, মে ২০১৮, পৃ. ২০৫-২০৬
২. Maggie Ann Bowers, *Magic(al) Realism*, Routledge, London and New York, 2004, p. 10
৩. রবিন পাল, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৮
৪. জীবনানন্দ দাশ, *জীবনানন্দ দাশ প্রকাশিত-অপ্রকাশিত কবিতাসমগ্র*, আবদুল মান্নান সৈয়দ (সং. ও সম্পা.), অবসর, ঢাকা, মে ২০১৮, পৃ. ৮৪
৫. তদেব, পৃ. ১৪৩
৬. কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, 'তিরিশের কবিতা', অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ও দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা.), *আধুনিক কবিতার ইতিহাস*, দে'জ, কলকাতা, ডিসেম্বর ২০১৬, পৃ. ১১২-১১৩
৭. জীবনানন্দ দাশ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬২
৮. তদেব, পৃ. ১৯০
৯. তদেব, পৃ. ২১২
১০. তদেব, পৃ. ২২১
১১. Maggie Ann Bowers, Ibid, p. 9
১২. জীবনানন্দ দাশ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৭
১৩. তদেব, পৃ. ২৭১
১৪. তদেব, পৃ. ৩০৫
১৫. তদেব, পৃ. ৮৬
১৬. বুদ্ধদেব বসু, *বুদ্ধদেব বসু নির্বাচিত প্রবন্ধসমগ্র*, বেগম আকতার কামাল (সং. ও সম্পা.), অবসর, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ২৯৩
১৭. David K. Danow, *The Spirit of Carnival: Magical Realism and the Grotesque*, The University Press of Kentucky, 2004, p. 9-10
১৮. জীবনানন্দ দাশ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৮
১৯. তদেব, পৃ. ২৭৩
২০. দীপ্তি ত্রিপাঠী, *আধুনিক বাংলা কাব্যপরিচয়*, দে'জ, কলকাতা, জুন ২০১৩, পৃ. ১৫০-১৫১
২১. ক্লিন্টন বি সিলি, *অনন্য জীবনানন্দ*, প্রথমা, ঢাকা, জানুয়ারি ২০১৮, পৃ. ১৬১
২২. জীবনানন্দ দাশ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৪
২৩. তদেব, পৃ. ২৪৬
২৪. তদেব, পৃ. ২৮৫
২৫. তদেব, পৃ. ১৭৪
২৬. Stephen M. Hart and Wen-Chin Ouyang, *A Companion to Magical Realism*, Woodbridge, UK, 2005, p. 4

২৭. জীবনানন্দ দাশ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৫
২৮. তদেব, পৃ.২৪২
২৯. Maggie Ann Bowers, Ibid, p. 31
৩০. জীবনানন্দ দাশ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০১
৩১. তদেব, পৃ. ১৩৩
৩২. প্রদ্যুম্ন মিত্র, *জীবনানন্দের চেতনাজগৎ*, দে'জ, কলকাতা, অক্টোবর ২০১১, পৃ. ১০৯
৩৩. আনন্দ ঘোষ হাজরা, 'জীবনানন্দের সময়চেতনা', রফিকউল্লাহ খান (সম্পা.), *মৃত পত্রে নীলোচ্ছ্বাস: জীবনানন্দ দাশ*, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ১৫৩
৩৪. জীবনানন্দ দাশ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৩
৩৫. তদেব, পৃ. ৫৯
৩৬. তদেব, পৃ. ১২৪
৩৭. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা কবিতার কালান্তর*, দে'জ, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৬, পৃ. ১৬৩
৩৮. জীবনানন্দ দাশ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮২
৩৯. মুনীর তৌসিফ, *মতবাদ কোষ ১ম খণ্ড*, সূচীপত্র, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১৫, পৃ. ৩৩৭
৪০. জীবনানন্দ দাশ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৩
৪১. তদেব, পৃ. ১৫৪-১৫৫
৪২. তদেব, পৃ. ১৮১
৪৩. বেগম আকতার কামাল, *জীবনানন্দ কথার গর্বে কবিতা*, কথাপ্রকাশ, ঢাকা, জানুয়ারি ২০১৮, পৃ. ৩৯
৪৪. জীবনানন্দ দাশ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৫
৪৫. তদেব, পৃ. ১৮৬
৪৬. বুদ্ধদেব বসু, 'মহাপৃথিবীঃ জীবনানন্দ দাশ' পূর্বাশা, চৈত্র ১৩৫১, উদ্ধৃতঃ দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, *জীবনানন্দ দাশ বিকাশ প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্ত*, দে'জ, কলকাতা, জুলাই ২০০৭, পৃ. ২৩৩
৪৭. জীবনানন্দ দাশ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৭